WBMDFC

KNOWLEDGE SERIES IV

কর্নেল স্যার হাসান সোহরাওয়ার্দী

চিকিৎসক, শিক্ষাবিদ ও কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য

মুখবন্ধ

সমাজ ইতিহাসের ধারায় দেখা গেছে কিছু কিছু মানুষ নিজের মেধা, পরিশ্রম ও অধ্যাবসায়-এর দ্বারা অনন্য হয়ে ওঠেন। সততা, মুক্ত চিন্তা ও মূল্যবোধের সমন্বয়ে গড়ে ওঠা তাদের ব্যক্তিত্ব নিজ প্রজন্ম ও পরবর্তী প্রজন্মের কাছে প্রেরণাস্বরূপ। 'পশ্চিমবঙ্গ সংখ্যালঘু উন্নয়ন ও বিত্ত নিগম' বিগত দিনের বাংলার কয়েকজন মনীষীর জীবন ও কর্মসাধনার বিবরণ (WBMDFC-Knowledge Series) একটি স্বল্প দৈর্ঘের তথ্যচিত্র ও পুস্তিকার মাধ্যমে বর্তমান প্রজন্মের কাছে তুলে ধরার প্রয়াস করেছে। এদের কর্মসাধনা ও জীবনব্রত পাঠে বর্তমান ও ভবিষ্যৎ প্রজন্ম অবশ্যই অনুপ্রাণিত হবে বলে আমাদের ধারণা। এই মহৎপ্রাণ মানুষদের প্রতি অন্তরের শ্রদ্ধা নিবেদন করছি এই ক্ষুদ্র প্রয়াসের মাধ্যমে।

ডঃ পি.বি.সালিম, আই.এ.এস
চেয়ারম্যান
পশ্চিমবঙ্গ সংখ্যালঘু উন্নয়ন ও বিত্ত নিগম

ভূমিকা

মানব সভ্যতার ইতিহাসে দেখা গেছে কিছু মানুষ নিজের মেধা, পরিশ্রম ও অধ্যাবসায় এবং ত্যাগ দ্বারা হয়ে ওঠেন কালজয়ী। মুক্ত চিন্তা ত্যাগ ও মানবজাতির সেবার মাধ্যমে তাদের কাজ চিন্তাভাবনা পরবর্তী প্রজন্মের কাছে প্রেরণাস্বরূপ হয়ে দাঁড়ায়। পশ্চিমবঙ্গ সংখ্যালঘু উন্নয়ন ও বিত্ত নিগম এরূপ মনীষীগণের জীবন ও কর্মসাধনা এ প্রজন্মের কাছে তুলে ধরার প্রয়াস করেছে। WBMDFC-Knowledge Series বিভাগে প্রথম চারজন মনীষী হাজি মহম্মদ মহসিন, ডঃ হাসান সোহরাওয়ার্দী, তিতুমির ও ভগিনী নিবেদিতার কর্মসাধনা অতি সংক্ষেপে এ বইটিতে তুলে ধরা হয়েছে। আমরা আশা রাখি এই পুস্তিকাটি পড়ে বর্তমান ও ভবিষ্যৎ প্রজন্ম উপকৃত হবে।

মৃগাঙ্ক বিশ্বাস, ডব্লিউ.বি.সি.এস (এক্সিকিউটিভ)
ম্যানেজিং ডাইরেক্টর
পশ্চিমবঙ্গ সংখ্যালঘু উন্নয়ন ও বিত্ত নিগম

কর্নেল স্যার হাসান সোহরাওয়ার্দী

চিকিৎসক, শিক্ষাবিদ ও কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য

আলিমুজ্জামান

প্রকাশকাল
মিলন উৎসব
ফেব্রুয়ারি, ২০২০

পশ্চিমবঙ্গ সংখ্যালঘু উন্নয়ন ও বিত্ত নিগম

কর্নেল স্যার হাসান সোহরাওয়ার্দী

চিকিৎসক, শিক্ষাবিদ ও কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য

কর্নেল স্যার হাসান সোহরাওয়ার্দীর জন্ম ১৮৮৪ সালের ১৭ নভেম্বর ঢাকায়। নিঃসন্দেহে সোহরাওয়ার্দী পরিবারটি

উপমহাদেশের এক অসাধারণ ঐতিহ্যবাহী পরিবার। উনিশ শতকের বাঙালি মুসলমান নবজাগরণের অগ্রদূত মাওলানা ওবায়দুল্লাহ আল ওবায়দী সোহরাওয়ার্দীর তৃতীয় পুত্র ছিলেন কর্নেল স্যার হাসান সোহরাওয়ার্দী। সোহরাওয়ার্দী পরিবার সুফি সাধক ও পীর বংশীয় হলেও তাঁরা ইংরেজি শিক্ষা গ্রহণ করেছিলেন উনিশ শতকের মাঝামাঝি থেকেই। শুধু তাই-ই নয় মাওলানা ওবায়দুল্লাহ ইংরেজি সহ পাশ্চাত্য জ্ঞান বিজ্ঞান চর্চা ও নারী শিক্ষা বিস্তারের ছিলেন পথিকৃৎ। মাওলানা ওবায়দুল্লাহ অপ্রতিদ্বন্দ্বী পণ্ডিত ছিলেন তাঁর সমকালে। তিনি হুগলী কলেজে অধ্যাপনা করার পর ১৮৭৪ সালে ঢাকা মাদ্রাসা প্রতিষ্ঠার সঙ্গে যুক্ত থেকে সুপারিনটেনডেন্টের দায়িত্বে ছিলেন আমৃত্যু। মেধা, শিক্ষা ও বুদ্ধি বৃত্তির গুণে তিনি বড় হয়ে নিজেকে প্রতিষ্ঠিত করেছিলেন সমাজের

উচ্চস্তরে। সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি ও সৌহার্দ্য বজায় রেখে তৎকালীন বাঙলায় গঠিত 'সমাজ সম্মিলনী'-র মাওলানা ওবায়দুল্লাহ ছিলেন প্রথম সাধারণ সম্পাদক, ঢাকা পৌরসভার কমিশনার ও অনারারি ম্যাজিস্ট্রেট। অসাধারণ পাণ্ডিত্যের জন্যই ব্রিটিশ সরকার তাঁকে বাহারুল উলুম বা বিদ্যাসাগর উপাধিতে ভূষিত করেন। আরবি, ফার্সি, উর্দু ও ইংরেজি ভাষায় তাঁর প্রায় আটচল্লিশ খানা গ্রন্থের সন্ধান পাওয়া যায়। মাওলানা ওবায়দুল্লাহ'র আত্মজীবনী ফার্সি ভাষায় লিখিত 'দস্তনে ইব্রাতবার' গ্রন্থ থেকে তাঁর সময়কালের মুসলমান সমাজের শিক্ষা, সংস্কৃতি চর্চাসহ আরও অনেক কিছু জানা যায়। তাছাড়া এই গ্রন্থে উল্লেখ আছে, নিজের বংশ পরিচয়, বাল্যজীবন, শিক্ষা-দীক্ষা, কর্মজীবন ও জ্ঞান চর্চাসহ শিক্ষা সাধনার বিষয়াদির বিবরণ।

১৮৮৬ সালের ৯ ফেব্রুয়ারি মাওলানা ওবায়দুল্লাহ'র ঢাকায় জীবনাবসান ঘটে এবং লালবাগ কেল্লার শাহী মসজিদের পাশে তাঁকে দাফন করা হয়।

মাওলানা ওবায়দুল্লাহ'র তৃতীয় স্ত্রী মকবুল নেসা বেগমের গর্ভে চার পুত্র ও চার কন্যার জন্ম। তাঁর পর পর দু'জন স্ত্রীর মৃত্যু হলে তিনি তৃতীয় স্ত্রী গ্রহণ করেন। মেদিনীপুরের ঘোড়ামারার জমিদার উকিল মুন্সি মুহাম্মদ মুকররমের কন্যা মকবুল নেসা ছিলেন প্রকৃতই একজন বিদুষী ও রত্নাগর্ভা মহিলা। তাঁর পুত্ররা যথাক্রমে মামুন, আবদুল্লাহ আল মামুন, হাসান ও মাহমুদ সোহরাওয়ার্দী এবং কন্যারা খুজিস্তা আখতার, ফাতিমা আজিজ আখতার, কামরুন্নেসা ও চতুর্থ কন্যার পাঁচ বছর বয়সে মৃত্যু হয়। মাওলানা ওবায়দুল্লাহ ১৮৭৪ সাল থেকে ১৮৮৬ সাল পর্যন্ত ঢাকা আলিয়া মাদ্রাসা ভবনে থাকাকালীন সময় কালে জন্ম হয় ছেলে মেয়েদের।

কর্নেল হাসান সোহরাওয়ার্দীর মেজো ভাই ডঃ স্যার আবদুল্লাহ আল মামুন আল সোহরাওয়ার্দীর (১৮৭৭-১৯৩৫) ছিল বিশ্বব্যাপী ইসলামী চিন্তা চেতনার ক্ষেত্রে এক প্রাজ্ঞ ও ক্ষুরধার পাণ্ডিত্য। The Sayings of Muhammad (মুহাম্মদ (সা.) এর বাণী) গ্রন্থখানি রচনা

করে তিনি বিশ্বব্যাপী প্রশংসিত হন। গ্রন্থটির ব্যাপক পাঠক প্রিয়তা ছিল ঈর্ষনীয়। পৃথিবীখ্যাত দু'জন মানুষের প্রিয় ছিল গ্রন্থটি। একজন মহাত্মা গান্ধী ও অপরজন লিও তলস্তয়। স্যার হাসান ২য় সংস্করণের ভূমিকায় ১৯৩৭ সালে লেখেনঃ ... এই ছোট বইটি রসুলুল্লাহ (সা.)-এর কিছু সুন্দরতম বাণীর সংকলন, যা সরল ও ফলপ্রসূ ইংরেজিতে অনূদিত। আর তা প্রকাশের উদ্দেশ্য হল হয়রত মুহাম্মদ (সা.)-এর ইসলাম প্রচারের কাল থেকে ন্যায় পরায়ণতা, একতা ও আল্লাহর ইচ্ছার প্রতি আনুগত্য সম্পর্কে যে আলোকবর্তিকা আমাদের চরিত্র ও চিন্তায় দিশারি হয়ে আছে, পাশ্চাত্যেও তা ছড়িয়ে দেওয়া। ইসলামের অর্থ ও বাণী সম্পর্কিত বহু ভ্রান্ত ধারণা দূর করেছে এই ক্ষুদ্রায়ত বইটি, বিশেষ করে, ইসলামে সহিষ্ণুতা ও নারীর মর্যাদা সম্পর্কে।

এছাড়া ডঃ আবদুল্লাহ আল মামুন, ঠাকুর প্রফেসর ছিলেন কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের। ইরানের শাহ্ তাঁকে "ইফতেখারুল মিল্লাত" উপাধি দেন। ১৯০৫ সালে তিনি লন্ডনে প্যান ইসলামিক

সোসাইটি স্থাপন করেন।

সোহরাওয়ার্দী পরিবারের মহিলাদের প্রতিভাও ছিল উল্লেখ করার মতো। স্যার হাসান সোহরাওয়ার্দীর বড় বোন খুজিস্তা আখতার বানু (১৮৭৪-১৯১৩) ছিলেন সেকালের একজন অত্যন্ত বিরল প্রতিভার অধিকারী। ১৯০৯ সালে তিনি 'সোহরাওয়ার্দীয়া বালিকা বিদ্যালয়' প্রতিষ্ঠা করেছিলেন কলকাতায়। খুজিস্তা আখতার বানু ভারতে প্রথম মুসলিম মহিলা ছিলেন সিনিয়র কেমব্রিজ পাশ করা। এ ছাড়াও তৎকালীন ভারতীয় পরীক্ষা নিয়ন্ত্রক বোর্ড থেকে অনার্স ডিগ্রিও লাভ করেন তিনি। ভারতীয় মহিলাদের মধ্যে তিনি ছিলেন কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের উর্দু ভাষা বিষয়ে এম এ পরীক্ষার পরীক্ষক। স্যার হাসান সোহরাওয়ার্দীর বড় বোন খুজিস্তা আখতার বানুর আর একটি পরিচয় হচ্ছে, অবিভক্ত বাঙলার শেষ প্রধানমন্ত্রী হোসেন শহীদ সোহরাওয়ার্দীর মাতা ছিলেন তিনি।

স্যার হাসান সোহরাওয়ার্দীর একমাত্র কন্যা শায়েস্তা আখতার বানু (১৯১৫-২০০০) ছিলেন কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রথম মুসলমান, ইংরেজি ভাষা ও সাহিত্যের অনার্স গ্র্যাজুয়েট। লন্ডন বিশ্ববিদ্যালয় থেকে *'Development of The Urdu Novel And Short Story'* বিষয়ে থিসিস জমা দিয়ে পি এইচ ডি প্রাপ্ত হন। এটি ছিল দুনিয়ার মুসলমান মহিলা ও এশিয়ান মহিলাদের মধ্যে প্রথম। এই প্রেক্ষিতে শায়েস্তার ভূয়সী প্রশংসায় ভরিয়ে দেন মার্কুইস অব জেটল্যান্ড তাঁর এক বক্তৃতায়।

স্যার হাসান সোহরাওয়ার্দীর বাল্য ও কৈশোর বেশ কিছুকাল অতিবাহিত হয়েছে ঢাকায়। বিশেষ এই সময়কাল অতিবাহিত হয়েছিল ঢাকা আলিয়া মাদ্রাসায় পিতার চাকুরির সুবাদে। তাঁর পড়াশুনা শুরু হয়েছিল ঢাকা মাদ্রাসায় পিতার গভীর তত্ত্বাবধানে। পরবর্তী সময়ে তিনি শিক্ষালাভ করেছিলেন ঢাকা কলেজ এবং

কলকাতা মেডিক্যাল কলেজে। এরপর ডাক্তারি শাস্ত্রের ওপর উচ্চতর শিক্ষার জন্য লন্ডন, ডাবলিন, এডিনবরা সহ ইউরোপের আরও অন্যান্য জায়গায় গেছেন।

খুব অল্প বয়সে ঢাকার নবাব সৈয়দ মোহাম্মদ আজাদ এর কনিষ্ঠ কন্যা শাহবানু বেগমের সঙ্গে বিয়ে হয় স্যার হাসান সোহরাওয়ার্দীর।

উল্লেখ্য, শাহবানু ছিলেন নবাব আবদুল লতিফ (১৮২৮-১৮৯১) এর দৌহিত্রী। স্যার হাসান ও বেগম শাহবানু দম্পতি ছিলেন দুই সন্তানের পিতা মাতা। একমাত্র কন্যা শায়েস্তা আখতার খুবই প্রতিভাময়ী মহিলা ছিলেন। তাঁর কথা আগেই উল্লেখিত হয়েছে। একমাত্র পুত্র হাসান মাসুদ সোহরাওয়ার্দী (১৯০৩ - ১৯২০) যক্ষ্মারোগে মারা যান মাত্র সতের বছর বয়সে। মাত্র তেইশ বছরের যুবক, ডাক্তার হাসান, আফগানিস্তানের আমীর হাবিবুল্লাহ'র সহকারী মেডিক্যাল অফিসার নিযুক্ত হন ১৯০৭-০৮ সালে। অতি অল্প বয়স থেকেই ডা. হাসান এধরনের দায়িত্ব পালনে সসম্মানে উত্তীর্ণ হয়েছেন।

স্যার হাসান সোহরাওয়ার্দী অতি উচ্চস্থারে অধিকারী ছিলেন ব্রিটিশ ভারতের চিকিৎসা বিদ্যার নানা ক্ষেত্রে। সাধারণ একজন হাউস সার্জেন হিসেবে কর্মজীবন শুরু করে তিনি শেষ পর্যন্ত

মেডিক্যাল কলেজের অবৈতনিক কনসালটিং সার্জেন নিযুক্ত হন। স্যার হাসানই ভারতে প্রথম এই পদে নিযুক্ত হয়েছিলেন একজন ভারতীয় হিসেবে। এছাড়াও প্রথম ভারতীয় হিসেবে নিযুক্ত হয়েছিলেন হাওড়ার জেনারেল হাসপাতালের সার্জেন ও সিভিল সার্জেনর পদটিতে এবং স্টেট রেলওয়ের চিফ মেডিক্যাল অফিসার ছিলেন ১৯২৮-১৯৩৭ সাল পর্যন্ত। আইনানুসারে সভাপতির পদটি ব্রিটিশ ভারতীয় মেডিক্যাল সার্ভিসের ডিরেক্টর জেনারেলের জন্য নির্দিষ্ট ছিল, যখন থেকে এই কাউন্সিল গঠিত হয়েছিল। স্যার হাসান পর পর দু'বারের জন্য ওই উচ্চ পদটিতে আসীন হন ডা. বিধানচন্দ্র রায় ও ডা. দেশমুখের সঙ্গে নির্বাচনে প্রতিদ্বন্দ্বিতায় জয়ী হয়ে। সে সময়ে এটা ছিল স্যার হাসানের পক্ষে খুবই গৌরবের।

ঔষধ বিদ্যা *(M.D),* অস্ত্রোপচার বিদ্যা (F.R.C.S.) জনস্বাস্থ্য *(D.P.H.)* ও প্রসূতি *L. M. Rotunda* চিকিৎসা বিজ্ঞানের এই চারটি প্রধান বিভাগের উচ্চ পোষ্ট গ্র্যাজুটেয় ডিগ্রির অধিকারী ছিলেন স্যার হাসান সোহরাওয়ার্দী। ব্রিটিশ ডাক্তারসহ অন্যান্য সম্প্রদায়ের কেউ-ই স্যার হাসানের মতো যোগ্যতা অর্জন করতে পারেননি সে সময়ের ব্রিটিশ ভারতে।

স্যার হাসান সোহরাওয়ার্দী চিকিৎসা বিজ্ঞান বিষয়ের উপর বহু পুস্তিকা রচনা করেছিলেন জনসাধারণের কথা ভেবে। উল্লেখযোগ্য পুস্তিকাগুলির মধ্যে অন্যতম হচ্ছে—প্রসূতি ও শিশুমঙ্গল *(Mother and Infant Welfare),* ম্যালেরিয়া প্রতিরোধ *(Control of Malaria),* যৌন ব্যাধির প্রতিরোধ *(Control of Venereal Diseases)* প্রভৃতি। দীর্ঘদিন রেলওয়ে শ্রমিকদের মধ্যে চিকিৎসা করতে গিয়ে স্যার হাসান কলেরা রোগের আধুনিক পদ্ধতির চিকিৎসা ব্যবস্থা গ্রহণ করে লক্ষ লক্ষ দরিদ্র শ্রমিককে প্রাণে বাঁচিয়ে ছিলেন। সে সময়ে তাঁর পক্ষে এটা ছিল এক বিরাট গৌরবময় ভূমিকা।

ব্রিটিশ ভারতে বিশেষ করে তৎকালীন বাঙলা প্রদেশে স্যার

হাসান সোহরাওয়ার্দীর শিক্ষা ক্ষেত্রে অবদান স্মরণ করতে হয় শ্রদ্ধার সঙ্গেই। পঁচিশ বছর যাবৎ কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের সিনেট ও আট বছর ব্যাপী ছিলেন সিণ্ডিকেটের সদস্য। কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের বোর্ড অব মেডিসিন, আরবি, ফার্সি ও উর্দু বোর্ডের সভাপতি এবং ফ্যাকাল্টি অব মেডিসিনের ডিনের সম্মানীয় পদ অলঙ্কৃত করেছেন স্যার হাসান সোহরাওয়ার্দী।

কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের সঙ্কটকালে ১৯৩০-৩৪ সাল পর্যন্ত স্যার হাসান সোহরাওয়ার্দী পর পর দু'বার ভাইস-চ্যান্সেলারের দায়িত্ব পালন করেছেন, অতি যোগ্যতার সাথে। একথা বলা যেতেই পারে, কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের ইতিহাসে তিনি ছিলেন প্রথম মুসলমান ভাইস-চ্যান্সেলার। স্যার হাসানের সময়ে ম্যাট্রিকে প্রথম মাতৃভাষার মাধ্যমে শিক্ষাদান কর্মসূচীর গ্রহণের মধ্যে তাঁর বাংলা ভাষার প্রতি মমত্ববোধ লক্ষ্য করা যায়। এই মহতী কাজের জন্য তিনি চিরস্মরণীয় হয়ে থাকবেন বাঙালির কাছে। আরবি, ফার্সি, শিক্ষায় গ্রুপ সিস্টেম প্রবর্তনের মাধ্যমে ইসলামিক স্টাডিজের বহুসংস্কার সাধনসহ ওই বিষয়গুলির শিক্ষা পদ্ধতি বিজ্ঞানসম্মত ও যুগপোযোগী করে গড়ে তোলেন স্যার হাসান সোহরাওয়ার্দি। কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে তিনিই প্রথম উর্দু বিষয়ের জন্য অধ্যাপক পদ সৃষ্টি করেন এম এ ক্লাসের জন্য। নিজ অর্থব্যয়ে স্যার হাসান

'ইসলামী ভাবধারা ও তমদ্দুন'-বিষয়ে বক্তৃতা দানের ব্যবস্থা গ্রহণ করেন বিশ্ববিদ্যালয়ে। তিনি ইংল্যান্ডের রয়েল কলেজ অব সার্জেনের নির্বাচিত ফেলো ছিলেন। উল্লেখ্য, উপমহাদেশের তিনি ছিলেন এই পদটিতে দ্বিতীয় মুসলমান। স্যার হাসান ১৯৩১ সালে নিয়োগ প্রাপ্ত হন *Public Health and Hygiene* বিষয়ক বিশেষ পদে। ডাক্তারি শাস্ত্রে সর্বোচ্চ ডিগ্রিধারী স্যার হাসানের ইসলামিক জ্ঞানচর্চায় অনায়াস দক্ষতা ছিল অসাধারণ। এই কারণেই কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের ইসলামিক ইতিহাস ও সংস্কৃতি বিষয়ের অধ্যাপনার কাজে নিযুক্ত হন ১৯৪৫ সালে।

কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় ছাড়াও স্যার হাসান সোহরাওয়ার্দী ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, আলীগড় মুসলিম বিশ্ববিদ্যালয় কোর্টের সদস্য ও কার্যকারী সভার সদস্য ছিলেন বিভিন্ন সময়ে। তিনি ছিলেন একজন প্রকৃত শিক্ষাদরদী ও শিক্ষাব্রতী। তাই বিশ্ববিদ্যালয়গুলিতে তিনি দীর্ঘদিন বিভিন্ন পদ অলঙ্কৃত করেছেন ও আজীবন কাজ করে গছেন গভীর নিষ্ঠার সঙ্গে। ১৯৩১-এ ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের অধীন বিশ্ববিদ্যালয়গুলির এক বিশেষ সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয় ইংল্যান্ডে। এই সম্মেলনে ভারতীয় দলের নেতৃত্বে ছিলেন স্যার হাসান সোহরাওয়ার্দী এবং সর্বপ্রথম একজন ভারতীয় হিসেবে তিনি সভাপতিত্ব করেন সম্মেলনের একটি বিশেষ শাখায়। এইরূপে স্যার হাসান জীবনের প্রতিটি ক্ষেত্রে নিজ প্রতিভাবলে পরাধীন ভারতে মুক্তিকামী মানুষদের জন্য বহন করে এনেছিলেন অফুরন্ত গৌরব। ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের অধীন বিশ্ববিদ্যালয় সমূহের যে ব্যুরো তৎকালে ছিল তার এবং রয়েল এশিয়াটিক সোসাইটির কার্যকারী সমিতির একজন সক্রিয় সদস্যের দায়িত্বও অতি গুরুত্ব সহকারে পালন করে গেছেন স্যার হাসান। লন্ডন বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ স্যার হাসান সোহরাওয়ার্দীকে গৌরবান্বিত করেছিলেন 'এল এল ডি' উপাধি প্রদানের মাধ্যমে। একই সময়ে আর্ল গ্রে ও আর্ল বলডুইনের মতো

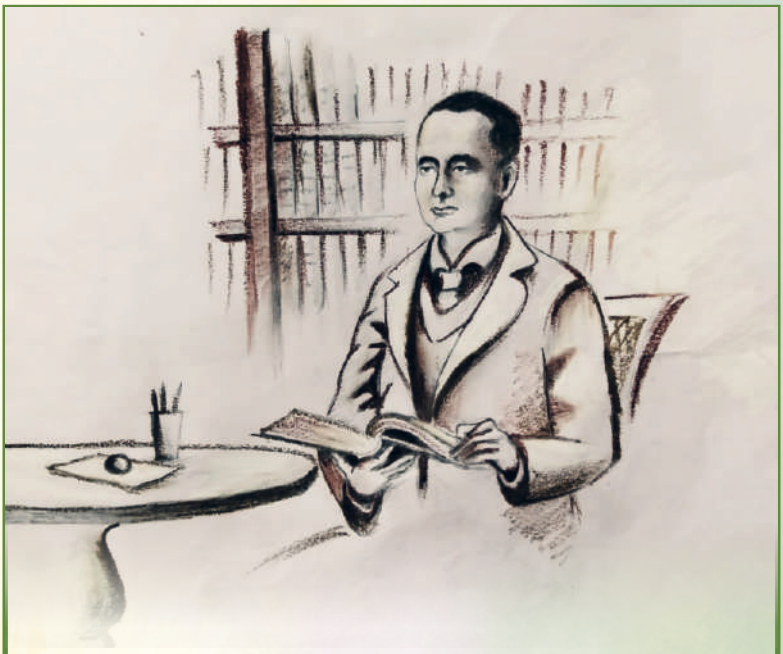

পৃথিবীখ্যাত রাজনৈতিক ব্যক্তিদ্বয়ও একই সঙ্গে এই বিরল সম্মানের অধিকারী হন। দেশের স্বাধীনতা প্রাপ্তি পর্যন্ত স্যার হাসান ছাড়া আর কোন এশিয়াবাসীর ভাগ্যে এই সম্মান প্রাপ্তি ঘটেনি।

কর্নেল স্যার হাসান সোহরাওয়ার্দী একজন ডাক্তার হিসেবে জীবনের প্রতিটি ক্ষেত্রে যেমন চরম সাফল্য লাভ করেছিলেন তেমনি ইসলামিক জ্ঞান চর্চা ও প্রসারে ছিল তাঁর অসামান্য ভূমিকা। সত্যিকারের তিনি ছিলেন একজন সাচ্চা মুসলমান, প্রতিটি ক্ষেত্রে অভ্যস্ত ছিলেন কোরান ও হাদিসের অনুশাসন অনুযায়ী চলতে। এছাড়া ইসলামের কল্যাণে যেমন অশেষ সময় দিতেন তেমনি ব্যয় করতেন প্রচুর অর্থ। ১৯৩৯-৪৪ সাল পর্যন্ত সময়ে ইংল্যান্ডে অবস্থান কালে স্যার হাসান উদ্যোগী হন সেখানে কয়েকটি মসজিদ ও ইসলামিক জ্ঞানচর্চা কেন্দ্র প্রতিষ্ঠায়। প্রধানত তাঁরই একক উদ্যোগের ফলে ১৯৪১ সালের আগস্ট মাসে ইস্ট লন্ডন মসজিদ ও

ইসলামিক জ্ঞানচর্চার কেন্দ্রটির কাজ সমাপ্ত হয়। পূর্ব লন্ডনের অধিকাংশ মুসলমানই ছিলেন বর্তমান পাকিস্তান এলাকার অধিবাসী, সেখানেই গড়ে উঠেছিল এই মসজিদ। এই সব জায়গার মুসাফির মুসলমানরা ছিলেন সাধারণত তৎকালীন বাংলা ও আসাম প্রদেশের

নির্ভীক সব খালাসি এবং পাঞ্জাব ও সীমান্ত এলাকার সাহসী পাঠানরা। ইস্ট লন্ডনে মসজিদ নির্মাণের পরিকল্পনা বহুদিন আগে থেকে থাকলেও বাস্তবায়িত করা যাচ্ছিল না নানা বাধা বিপত্তির জন্য। ওইসব মুসলমান খালাসিরা লন্ডনে অবস্থানকালে জুম্মা ও ঈদের নামাজ পড়তে বাধ্য হতেন একটা ভাড়াটে নাচঘরে। প্রধানত স্যার হাসানের সুদক্ষ কর্মকুশলতার জন্যই দীর্ঘকালের একটা বিরাট অভাব দূরীভূত হয় এই মসজিদটি নির্মাণের ফলে। ইস্ট লন্ডন মসজিদটির সম্পূর্ণ নির্মাণ কাজ শেষ হয় ১৯৪১ সালে। ওই বছরের ঈদ-উল-আযহার জামাত প্রথম অনুষ্ঠিত হয়েছিল ওই মসজিদে। উল্লেখযোগ্য বিষয় হচ্ছে, মুসল্লি সাধারণের অনুরোধে স্যার হাসান সোহরাওয়ার্দী সেই ঈদের জামাতে ইমামতি ও খুৎবা পাঠ করেছিলেন। এ ছাড়াও স্যার হাসান কার্ডিফের মসজিদে ইসলামিক সংস্কৃতি ও জ্ঞানচর্চার কেন্দ্র ও ১৯৪৪ সালে জামিয়া কেন্দ্রীয় মসজিদের প্রতিষ্ঠা করেন লন্ডন রিজেন্ট পার্কে। ১৯৩৯-১৯৪৪ সাল পর্যন্ত পাঁচ বছর যাবত লন্ডন মসজিদ নিজামিয়া ও ওকিং মসজিদের কার্যকারী সভার সভাপতি ছিলেন স্যার হাসান।

বেশ কয়েকটি গ্রন্থ রচনা করেন স্যার হাসান সোহরাওয়ার্দী। এই গ্রন্থগুলির মধ্যে বিশেষ করে ইউরোপীয়ান ইসলাম সম্পর্কে অজ্ঞতা দূর করবার উদ্দেশ্য ছিল তাঁর। *Truth about Mohammad and Mohammedanism (Oxford University Press)* নামক গ্রন্থটিতে তিনি দুনিয়ার শ্রেষ্ঠতম ধর্ম যে ইসলাম, সেটি প্রতিপন্ন করেছেন সুন্দরভাবে। বিশ্ব ধর্ম সম্মেলন অনুষ্ঠানে স্যার হাসান এক সুন্দর সাবলীল অভিভাষণ পাঠ করেছিলেন, সেই অভিভাষণই পুস্তকাকারে পরে প্রকাশিত হয়েছিল *Islam* নামকরণে। বিশ্ব ধর্ম সম্মেলনে সেদিন উপস্থিত সকল সুধী ও প্রাজ্ঞজনেরা মুগ্ধ ও বিস্মিত হয়ে যান তাঁর সরল ও সুন্দর ব্যাখ্যায়। তাঁর মেজো ভাই ডঃ স্যার

আবদুল্লাহ আল মামুন আল সোহরাওয়ার্দী লিখিত *Saying's of Mohammad* নামে বিখ্যাত গ্রন্থটি সংশোধন করে তিনি ১৯৪১ সালে প্রকাশ করেন আরবি ও ইংরেজি ভাষায়। ফার্সি ভাষায় লিখিত গ্রন্থটিতে সুন্দরভাবে তুলে ধরা হয়েছে, মহানবী মুহাম্মদ (সা.) এর

বাণীসমূহ। ওই সময়ে ইংল্যান্ড থেকে প্রকাশিত *Islam Today* নামক গ্রন্থের বিশেষ অধ্যায়, 'ভারতে ইসলাম' লেখার দায়িত্ব অর্পিত হয়েছিল স্যার হাসান সোহরাওয়ার্দীর উপর। তিনি অত্যন্ত যোগ্যতার সাথেই শেষ করেছিলেন কাজটি। তাঁর আরও কয়েকটি রচনার মধ্যে উল্লেখ করতে হয়— *Calcutta and environs an illustrated guide is places of interest and to excursions in and around Calcutta (1921-24), Calcutta and environs (1924), World regions : their contrasts and resembleances : Islam (1941* প্রভৃতি।

স্যার হাসান পবিত্র হজ্ব আদায় করেন ১৯৩৮ সালে। মদিনা শরিফে তিনি রসুলুল্লাহ'র (সা.) রওজা মোবারক সহ ইসলামের চার ইমাম এবং মধ্যপ্রাচ্য ও মধ্য এশিয়ার বহু অলি আওলিয়ার মাজার শরীফ জিয়ারত করেছিলেন। এছাড়াও তিনি গমন করেন প্রথম কেবলা বায়তুল্লাহ মোকাদ্দেশ। তৎকালীন মুসলিম জাহানের মধ্যে উত্তর ও পশ্চিম আফ্রিকা, মধ্য প্রাচ্য সহ মধ্য এশিয়ার সকল স্থান সফর করেন তিনি। স্যার হাসান এ সময়ে মোলাকাত ও আলাপ আলোচনা করেছিলেন জাইরাতুল আরবের বাদশাহ ইবনে সঊদ, ইরানের শাহানশাহ রেজাশাহ পহলবী, মিশরের বাদশাহ ফারুক ও ইরাকের আবদুল্লাহ'র সাথে। তৎকালীন মধ্যপ্রাচ্যের এই সব সম্মানীয় বাদশাহরা পরম সমাদরে স্যার হাসানকে আপ্যায়িত করেন ও মুগ্ধ হন যে, তাঁকে একটি বহু মূল্যবান আরবি পোশাক উপহার স্বরূপ দেন সুলতান আবদুল আজিজ ইবনে সঊদ। ইউরোপ ও আমেরিকা সফরের মারফতে স্যার হাসান পাশ্চাত্য ভাবধারা সম্পর্কে সম্যক অভিজ্ঞতা অর্জনে সমর্থ হন।

ব্রিটিশ ভারতের বড়লাট ও গভর্নরদের, এদেশীয় আইন ও শাসন সংক্রান্ত যাবতীয় বিষয়ে তত্ত্বাবধান করা ও সে সম্পর্কে ব্রিটিশ

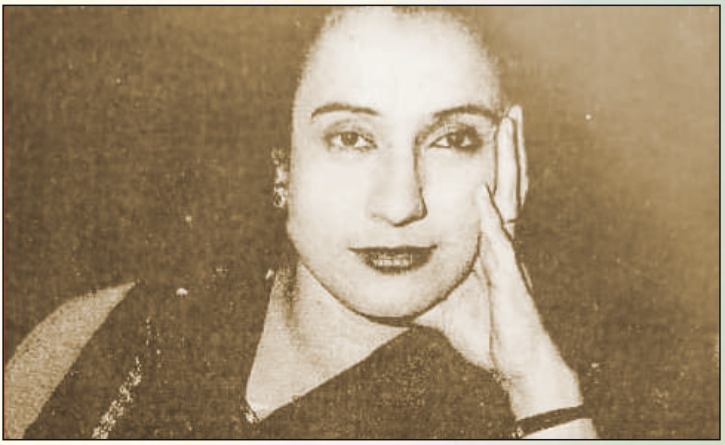

প্রধানমন্ত্রীকে পরামর্শ প্রদানের জন্য স্যার হাসান ছিলেন একজন উপদেষ্টা। এই কাজে ১৯৩৯-৪৪ সাল পর্যন্ত ব্রিটিশ ভারতীয় মুসলমানদের দারিদ্রতাকে জাতীয় দাবী হিসেবে ব্রিটিশ পার্লামেন্ট সহ বহির্বিশ্বে নানা যুক্তি তুলে ধরে দীর্ঘদিনের একটা ভুল ধারণা ভেঙে দিয়েছিলেন তিনি। ব্রিটিশ ভারতে বিভিন্ন উচ্চপদে আসীন থাকা সত্ত্বেও তিনি প্রকাশ্যে ও নির্ভীকতার সাথে সমর্থন করে গেছেন একের পর এক ভারতের জাতীয় দাবীগুলি। এ সম্পর্কিত প্রচুর প্রবন্ধ-নিবন্ধ লেখেন তৎকালীন বিলেতের বিখ্যাত কাগজগুলিতে। লন্ডনের রয়েল সোসাইটি হলে ইস্ট ইণ্ডিয়া অ্যাসোসিয়েশন ও রয়েল সেন্ট্রাল এশিয়ান সোসাইটি'তে এক যুক্ত সভা অনুষ্ঠিত হয় ১৯৪২ সালের ৮ নভেম্বর। এই যুক্ত সভায় উপস্থিত ভারতের বারোজন প্রাক্তন লাট ও ব্রিটিশ পার্লামেন্টের বহু সদস্যদের সামনে, ভারতের বিভিন্ন সমস্যাসহ মুসলমানদের বিভিন্ন দাবী দাওয়া নিয়ে চমৎকার অথচ সুনিশ্চিত বক্তব্য প্রদান করেন স্যার হাসান। সভায় উপস্থিত গণ্যমান্য সকল সদস্য সেদিনে মেনে নেন স্যার হাসানের সব যুক্তিপূর্ণ অথচ বাস্তবচিত দাবীগুলি।

শুধুমাত্র চিকিৎসা জগতেই নয়, শিক্ষা বা ইসলামের খেদমতেও

নয়—সুস্থ মানবতার চর্চাও মানব সেবায় স্যার হাসানের মতো তৎকালে সমকক্ষ বিরল মানুষ ছিলেন না বললেই হয়। 'আঞ্জুমান খাদেমুল আনাম' নামে এক জনসেবামূলক প্রতিষ্ঠানের প্রতিষ্ঠাতা ও তার সভাপতিও ছিলেন তিনি দীর্ঘদিন। সমিতির পক্ষ থেকে ১৯৩৬-৩৭ সালে বহু কাজের পরিকল্পনা ও বাস্তবায়ন হয়েছিল অধিকাংশ ক্ষেত্রে।

স্যার হাসান একটা শিশু বিশ্রামাগার প্রতিষ্ঠা করেন ১৯৩৬ সালে ইউরোপীয় ধাঁচে, এই বিশ্রামাগারে শ্রমিকরা তাঁদের শিশুদের রেখে যেতে পারতো কাজে যাবার সময়ে। শিশুদের স্বাস্থ্যসম্মতভাবে পরিচর্যার ব্যবস্থা ছিল বিশ্রামাগারে। তৎকালে পরাধীন ভারতে বাঙলার মতো একটা প্রদেশে এমন ইউরোপীয় ধাঁচের বিশ্রামাগারের পরিকল্পনা ও তার বাস্তবায়ন একমাত্র স্যার হাসানের দ্বারাই সম্ভব হয়েছিল। ১৯৩৮ সালের একটা হিসেবে দেখা যায়—ওই বছরে ৫১৯০ জন শিশুর প্রত্যেককে বিনামূল্যে খাদ্য, দুধ প্রভৃতি সরবরাহের মাধ্যমে উত্তম পরিষেবা দে'য়া হয়েছিল। সেদিনে বিরল ঘটনাই ছিল, ব্রিটিশ ভারতে শিশুদের জন্য এরকম একটা সুব্যবস্থা।

চিকিৎসা জগতে খ্যাতিমান ডঃ স্যার হাসান, নিকটবর্তী দরিদ্র পরিবারের আসন্ন প্রসবা নারীদের জন্য একটি প্রসূতি সদনেরও প্রতিষ্ঠা করেছিলেন ১৯৩৭ সালে। ওই নারী ও সদ্য প্রসবা শিশুদের জন্য চিকিৎসাসহ যাবতীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করা হতো উন্নত মানের। যেমন, এখানেই দুধ, মাখন ও রুটি সবই বিনামূল্যে বিতরণের ব্যবস্থা নিয়েছিলেন স্যার হাসান। শুধু তাই-ই নয়, স্বাস্থ্যসম্মত উপায়ে শিশুপালন শিক্ষার উদ্দেশ্যে এক শিক্ষাগারও যুক্ত করেছিলেন এর সঙ্গে।

১৯৩৭ সালে একটা দাতব্য চিকিৎসালয় খোলাও স্যার হাসানের মহান কীর্তির মধ্যে অন্যতম। এই প্রতিষ্ঠানটিকে কেন্দ্র করে পরে

অনেক শাখা প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল। এই শাখাগুলির মধ্যে অন্যতম ছিল যক্ষ্মা নিবারণী, যৌন ব্যাধি, চক্ষু-কর্ণ-নাসিকা ও স্ত্রী রোগ শাখা। যক্ষ্মা নিবারণী শাখাটি স্থাপনের পিছনে ছিল এক মর্মান্তিক ঘটনা। তাঁর একমাত্র পুত্র হাসান মাসুদ সোহরাওয়ার্দী (১৯০৩-২০) মাত্র সতেরো বছর বয়সে যক্ষ্মা রোগে আক্রান্ত হয়ে মারা যান, দারুন এই আঘাতে স্যার হাসান ভেঙে না পড়ে রোগটির মূলোৎপাটন কিভাবে করা যায় সে বিষয়ে সুনির্দিষ্ট পরিকল্পনা হাতে নেন। দেশে একটা শ্রেষ্ঠ গবেষণাগার নির্মাণ করে যক্ষ্মা রোগকে যাতে চিরতরে নির্মূল করা যায় তাঁর উদ্দেশ্যে তিনি 'হাসান মাসুদ সোহরাওয়ার্দী চ্যালেঞ্জ শীল্ড' প্রদান করেন। তৎকালে বার্মা সহ সমগ্র ব্রিটিশ ভারতে যক্ষ্মা নিবারণী প্রতিষ্ঠানগুলির মধ্যে প্রতিযোগিতার ব্যবস্থা হয়েছিল এবং প্রতি বছরই এই প্রতিযোগিতা হতো।

স্যার হাসান সোহরাওয়ার্দী জীবনে বহু উচ্চপদে কাজ করবার অভিজ্ঞতা অর্জন করেছিলেন। বঙ্গীয় আইন পরিষদের প্রথম

মুসলমান ডেপুটি প্রেসিডেন্টের দায়িত্বে ছিলেন ১৯২৩-২৫ সাল পর্যন্ত। ব্রিটিশ ভারতে বঙ্গীয় পাবলিক সার্ভিস কমিশনেও স্যার হাসান প্রথম মুসলমান সদস্য। পরাধীন ভারতে টেরিটরিয়াল ফোর্স উপদেষ্টা কমিটির সভাপতি ছিলেন তিনি। বাঙলার মুসলমানদের সামরিক শিক্ষার গুরুত্ব সম্পর্কে স্যার হাসান সজাগ করার চেষ্টা করেছিলেন। কারণ তিনি বুঝেছিলেন যে, সামরিক শক্তি ব্যতীত কোন জাতি স্বাধীনতা পেলেও তা রক্ষা করতে পারবেন না। তিনি ছিলেন কামাণ্ডিং অফিসার, এই সময়ে বহু বাঙলার নাগরিককে সামরিক বিভাগে ভর্তি করতে সাহায্য করেছিলেন।

এত বড় প্রতিভা, ব্যক্তিত্ব শক্তির অধিকারী হওয়া সত্ত্বেও স্যার হাসান ছিলেন একজন সত্যিকারের অমায়িক মানুষ, অহঙ্কার বলে তাঁর মধ্যে কিছু ছিল না। ইসলামের প্রকৃত শিক্ষা, অনুশাসন মেনেই ছিল তাঁর চলাফেরা, তিনি জীবনে ছোট বড় ফারাক যেমন বুঝতেন না, তেমনি তিনি ছিলেন সদা প্রফুল্ল, যে কেউ তাঁর সঙ্গে নির্বিঘ্নে মোলাকাত করতে পারতেন।

মুসলিম লীগের প্রার্থী হয়ে ১৯৪৬ সালের কেন্দ্রীয় ও বঙ্গীয় আইন পরিষদে, একই সঙ্গে বর্ধমান ও প্রেসিডেন্সি বিভাগ হতে বিপুল ভোটে জয়ী হন স্যার হাসান সোহরাওয়ার্দী।

স্যার হাসান জীবনে বহু সম্মানের অধিকারী হয়েছিলেন। ১৯৩২ সালের ১৭ ফেব্রুয়ারি তিনি অর্জন করেন নাইটহুড উপাধি। যদিও স্যার হাসান ওই উপাধি প্রত্যাখ্যান করেন ১৯৪৬ সালের আগস্ট মাসে। স্যার আবদুল কাদিরের জায়গায় ১৯৩৯ সালে তিনি নিযুক্ত হন *Secretary of State For India*-র অ্যাডভাইসার পদটিতে। পদোন্নতিটি ছিল মেডিসিন ও পাবলিক সার্ভিস কেরিয়ারের পক্ষে অত্যন্ত সম্মানজনক। অবশ্য স্যার হাসান ১৯৪৪ সালে পদত্যাগ করেন পদটি থেকে। আরও যে সব সম্মান বা উপাধি অর্জন করেছিলেন তাঁর মধ্যে উল্লেখযোগ্য হচ্ছে ১৯২৯ সালে

*O.B.E.,*কাইসার-ই-হিন্দ মেডেল পান ১৯৩০ সালে। ১৯৩২ সালের জানুয়ারি সেন্ট জন এর সম্মান সূচক *(O.S.T.J.)* একজন সহযোগী কর্মকর্তা নিযুক্ত হন। ১৯৩৭ সালের জানুয়ারিতে তাঁর পদোন্নতি হয় অ্যাসোসিয়েট কমাণ্ডারের পদে। কলকাতার পার্ক সার্কাসে 'সোহরাওয়ার্দী এভিনিউ' নামে একটি রাস্তার নামকরণ হয় ১৯৩৩ সালে স্যার হাসান সোহরাওয়ার্দীর জীবদ্দশায়। এই রাস্তার পাশেই তাঁর নিজস্ব বাড়ি 'কাসানা' যা আজও বর্তমান, বাড়িটি সগৌরবে দাঁড়িয়ে আছে বাংলাদেশ সরকারের গ্রন্থাগার হিসেবে। কর্নেল স্যার হাসান সোহরাওয়ার্দী ছিলেন একজন ক্ষণজন্মা ব্যক্তিত্ব, এ বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই। এই ক্ষণজন্মা মানুষটির ১৯৪৬ সালের ১৮ সেপ্টেম্বর কলকাতা স্কুল অফ ট্রপিকাল মেডিসিনে ৬২ বছর বয়সে জীবনাবসান ঘটে। তিনি চিরনিদ্রায় শায়িত আছেন পার্কসার্কাসের গোবরা কবরস্থানে।

জীবনপঞ্জি

১৮৮৪— ১৭ নভেম্বর ঢাকায় জন্ম।

১৮৮৬— ৯ ফেব্রুয়ারি পিতা মাওলানা ওবায়দুল্লাহ'র ঢাকায় মৃত্যু।

১৯০৩— একমাত্র পুত্র হাসান মাসুদ সোহরাওয়ার্দীর জন্ম।

১৯০৭-০৮— সহকারী মেডিক্যাল অফিসার নিযুক্ত আফগানিস্তানের আমীর হাবিবুল্লাহর।

১৯১৫— একমাত্র কন্যা শায়েস্তা আখতার এর জন্ম কলকাতায়।

১৯২০— একমাত্র পুত্র হাসান মাসুদ-এর মৃত্যু।

১৯২৩-২৫ বঙ্গীয় আইনসভার নির্বাচিত ডেপুটি প্রেসিডেন্টের দায়িত্ব পালন।

এছাড়া এই সময়ে পরাধীন ভারতে টেরিটরিয়াল ফোর্স উপদেষ্টা কমিটির সভাপতি।

১৯২৮-৩৭ স্টেট রেলওয়ের চিফ মেডিক্যাল অফিসার

১৯২৯— ঞ্জঙ্কসম্মান প্রাপ্তি।

১৯৩০— কায়সার-ই-হিন্দ মেডেল অর্জন।

১৯৩০-৩৪ কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য।

১৯৩১— ইংল্যান্ডের রয়েল কলেজ অব সার্জেনের ফেলো। *Public Health And Hygiene* -বিষয়ক পদে নিয়োগ। ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের অধীন বিশ্ববিদ্যালয় সমূহের ভারতীয় দলের প্রতিনিধিত্ব ও বক্তৃতা প্রদান।

১৯৩২— ১৭ ফেব্রুয়ারি নাইটহুড ও সেন্ট জনের সম্মানসূচক *OSTJ* অর্জন।

১৯৩৩— পার্ক সার্কাসে তাঁর বাসস্থান সংলগ্ন রাস্তাটির নামকরণ।
'সোহরাওয়ার্দী এভিনিউ' হয়।

১৯৩৬— শিশু বিশ্রামাগার নির্মাণ করেন।

১৯৩৬-৩৭— জনসেবামূলক প্রতিষ্ঠান 'আঞ্জুমান খাদেমুল আনাম' প্রতিষ্ঠা করেন।

১৯৩৭— দাতব্য চিকিৎসালয় তৈরি।

১৯৩৯— *Secretary of State for India*-র অ্যাডভাইসারের পদে নিয়োগ প্রাপ্তি।

১৯৩৮— পবিত্র হজ্ব আদায় করেন।

১৯৩৯-৪৪— লন্ডনে অবস্থানকালে কয়েকটি মসজিদ ও ইসলামী জ্ঞানচর্চার কেন্দ্র নির্মাণে প্রধান ভূমিকা গ্রহণ। পাঁচ বছর যাবত ছিলেন মসজিদগুলির কার্যকরী সভাপতি।

১৯৪১— ---ইংল্যান্ড থেকে প্রকাশিত *Islam Today* গ্রন্থের—'ভারতে ইসলাম' অধ্যায়টি লেখেন।

১৯৪৫— কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের ইসলামিক ইতিহাস ও সংস্কৃতি বিষয়ে অধ্যাপনা।

১৯৪৬— কেন্দ্রীয় ও বঙ্গীয় আইন পরিষদের নির্বাচনে দুটিতেই জয়লাভ।

১৮ সেপ্টেম্বর কলকাতা স্কুল অব ট্রপিক্যাল মেডিসিনে জীবনাবসান ও পার্কসার্কাস গোবরা কবরস্থানে অন্তিম শয্যা।

লেখক পরিচিতি

আলিমুজ্জমান
অবসরপ্রাপ্ত সহকারী প্রধান শিক্ষক
উদয়চাঁদপুর হাইস্কুল (উ.মা.)
মুর্শিদাবাদ

Helpline

1800 120 2130

Visit Us at

http://www.wbmdfc.org/

WEST BENGAL MINORITIES DEVELOPMENT FINANCE CORPORATION

(A Statutory Corporation under MA & ME Department, Govt. of West Bengal)

"AMBER" DD-27/E, Sector-I, Salt Lake City, Kolkata-700064

Printed at : Digital Graphics, 9830829976